জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-৮, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০১৮

ফেনী জেলার উল্লেখযোগ্য সন্মুখযুদ্ধ ও গণহত্যা (১৯৭১): একটি পর্যালোচনা

ড. শামছুল কবির*

Abstract

The Liberation War of 1971 was a very important event in the history of the Bengali Nation. The war was fought under the leadership of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and he announced the independence of Bangladesh on March 26, 1971. As a result, Feni district was tremendously influenced by the spirit of the liberation war. The liberation war of Feni district was led by Major (Captain during the Liberation War) Zafor Imam BB. He and other freedom fighters of this district are remembered with the honour for their contribution during the war. A significant number of clashes and battles took place between the freedom fighters and Pakistani soldiers followed by frontal war. The freedom fighters of Feni district played a vital role during the war of liberation. The Feni district was freed from enemies on 6 December 1971. A comprehensive history of the liberation war can only be composed through compiling all the local history on the war and hence this study attempts to focus on the memorable events of the liberation period of Feni district.

বর্তমানে বাংলাদেশের জেলাগুলোর মধ্যে ফেনী একটি অন্যতম জেলা। মুক্তিযুদ্ধকালীন ফেনী বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নোয়াখালী জেলার আয়তন অনেক বড় ও প্রশস্ত ছিলো বিধায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে এই জেলাকে বিভক্ত করে যে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত করে ফেনী তার অন্যতম।বর্তমানে ছয়টি উপজেলা নিয়ে ফেনী জেলা গঠিত।[১] ফেনী জেলা ভারতের সীমান্তবর্তী হওয়ায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধকালীন এ অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম ছিল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১ খিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। কিন্তুপাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের নানাবিধ বৈষম্য দেখা দেওয়ায়পূর্ব বাংলার জনগণের আশা ওস্বপ্ন অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এবংএ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা এবং স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত হয়। ফলে বাংলার জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে পূর্ববাংলার মুক্তি ও স্বাধীনতার ডাক দেন।[২]এরই ফলশ্রুতিতে২৫ মার্চ পাকবাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পরিপ্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরস্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়েই সমগ্র বাংলাদেশের ন্যায় ফেনী জেলায়ও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, সমগ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সুচারু, সুশৃঙ্খল, সুষ্ঠুও সুন্দরভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে মুজিবনগর সরকার সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১ টি সেক্টরে ভাগ করে এবং ২ নং সেক্টরের অধীনে ফেনী জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩] এই সেক্টরের কমান্ডার খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার্থে এটিকে আরও ছয়টি সাব-সেক্টরে ভাগ করেন। সাব-সেক্টরগুলো ছিলো[৪]-১.গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা, ২. মন্দভাগ, ৩. শালদা নদী, ৪. মতিনগর, ৫. নির্ভয়পুর, ৬. রাজনগর। উল্লেখ্য ফেনী জেলা রাজনগর সাব-সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যুদ্ধকালীন এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম।[৫] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার সাথে সাথেই ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে এই অঞ্চলের মুক্তিকামী জনগণ পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সন্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।ফেনী জেলায়সংঘটিত উল্লেখযোগ্য সন্মুখযুদ্ধ, সংঘাত-সংঘর্ষ, অপারেশন, গণহত্যা ও নির্যাতন ইত্যাদি ঘটনাবলির সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে গবেষণায় দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

১. ঐতিহাসিক পদ্ধতি: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থাদি, পত্র-পত্রিকা, ব্যক্তিগত ডায়েরি, চিঠিপত্র, সরকারি দলিলপত্র ইত্যাদি।

২. ক্ষেত্র জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি :ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা, সহযোদ্ধা, সহকর্মী, সহযোগী, প্রত্যক্ষদর্শী ও জনসাধারণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্থান, গণকবর, সমাধি, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি স্থান ও স্থাপনা অনুসন্ধান, সরেজমিনে জরিপ ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ফেনী জেলায় যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন,জনসাধারণের অংশগ্রহণের গতি-প্রকৃতি, তাদের যুদ্ধকালীন অবস্থা, প্রতিবন্ধকতা-সফলতা, যুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র অনুসন্ধান ও উপস্থাপন ও যুদ্ধক্ষেত্র, বধ্যভূমি এবং গণকবরের স্থান চিহ্নিতকরণসহ প্রভৃতি ঘটনাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক তথ্য উদঘাটন করাসহবস্তুনিষ্ঠভাবে ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক, তথ্যবহুল, নির্ভুল ও অবিকৃত ইতিহাস নব প্রজন্মের নিকট তুলে ধরাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গবেষণার যৌক্তিকতা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হলেও অঞ্চল ও জেলা ভিত্তিকমুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তেমন স্থান পায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও যুদ্ধে ফেনী জেলার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণের যে ভূমিকা ছিল তা প্রসংশনীয়। অথচ এই অঞ্চলের

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি আজও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, জনসাধারণের অংশগ্রহণসহ বিষয়াদির উপর সঠিক ও তথ্যনির্ভর পূর্ণাঙ্গ তেমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। ফলে আলোচ্য গবেষণায় ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘটে যাওয়া সংঘাত, সংঘর্ষ, যুদ্ধ, হতাহতের বিবরণ, যুদ্ধকালীন প্রতিবন্ধকতা, সংকট ও সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় যথাসম্ভব তথ্যবহুল ও পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত কিছু গ্রন্থ ও গবেষণায় তথ্যবিভ্রাট ও ইতিহাস বিকৃতির ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। কাজেই ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস রচনাসহ মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসজানার জন্য বর্তমানে গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। সর্বোপরি বিভ্রান্তিকর ও বিকৃত ইতিহাস জানা থেকে নব প্রজন্মকে রক্ষা করাসহ সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

সংগৃহীত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করেউক্ত জেলারউল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দশটি সন্মুখযুদ্ধ ও গণহত্যার ঘটনাবলির বিবরণ এই প্রবন্ধে যথাসম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট আক্রমণ (৩ এপ্রিল ১৯৭১)

ফেনী জেলা শহরে ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অবস্থিত। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে পাঞ্জাবি ও বিহারিদের ক্যাম্প গড়ে উঠে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফেনী জেলার সাধারণ জনগণও পাকনাহিনীর বর্বরতা ও হত্যাযজ্ঞের শিকার হন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিকেই এই জেলার সর্বস্তরের জনগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আনুমানিক ৩ এপ্রিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পে আক্রমণ চালায়। সেই সময় সাধারণ জনগণের হাতে ভারী অস্ত্র না থাকলেও তাঁরা বর্শা, বল্লম, কুঠার ও খন্তি ইত্যাদি দিয়ে পাঞ্জাবি ও বিহারিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে প্রায় ৫ জন বিহারি প্রাণ হারায় ও বেশ কয়েকজন আহত হয় এবং উপায়ন্তর না দেখে পাঞ্জাবি ও বিহারিরা দিক বিদিক ছুটে পালিয়ে যায়।[৬]

চিত্র-১: ফেনী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট বিহারি ক্যাম্পে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করেন

ফেনীতে পাকবাহিনীর গণহত্যা ও নির্যাতন (২৩ এপ্রিল ১৯৭১)

১৯৭১খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ শুরু হলে এর প্রভাব ফেনী জেলাতেও পড়ে। ২৩ এপ্রিল পাকহানাদার বাহিনী ফেনী মহকুমায় (বর্তমান ফেনী জেলা) প্রবেশ করে প্রথমে দরবেশ আব্দুল কাদিরকে গুলি করে হত্যা করে। তারা ফেনী শহরে প্রবেশকালে দেওয়ানগঞ্জ, আমতলী ও শহরতলীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এসব স্থানে পাকসেনারা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কয়েকজন লোককে হত্যা করে। তারা প্রতিদিন নির্বিচারে অনেককে হত্যা করতো। শহর উপকণ্ঠে একটি সরকারি ভবন সংলগ্ন বধ্যভূমিতে শত শত দেশপ্রেমিক বাঙালিকে হত্যা করা হয়। রাজাকার ও আল-বদর বাহিনীর সহায়তায় পাকবাহিনী ফেনীতে প্রবেশ করেই এই হত্যাকাণ্ড চালায়।[৭]

চিত্র-২: পাকবাহিনী ফেনী জেলায় প্রবেশ করেই ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৩ এপ্রিল এই স্থানটিতে গণহত্যা ও নির্যাতন চালায়

সিংহনগরে যুদ্ধ (২৯ জুন ১৯৭১)

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলায় সিংহনগর গ্রামটি অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকবাহিনীর ৩ জন সৈন্য সিংহনগর গ্রামে ঢুকে কয়েকজন নারীকে ধরে তাদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করলে খবরটি মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছা মাত্রই গ্রুপ কমান্ডার মোঃ রফিকুল ইসলাম ও আবু বকর ছিদ্দিকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ঐ পাকসেনাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে এবং সাথে সাথে পাকসেনারা পাল্টা গুলি চালায়। এতে একজন পাকসেনা নিহত হয়, একজন আহত হলেও তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে গ্রুপ কমান্ডার রফিকুল ইসলাম ও আবু বকর ছিদ্দিক আহত হন। উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আবু আহম্মদ, মহিউদ্দিন, এনামুল হক, নেছারুল হক, জহির চেয়ারম্যান ও কামাল উদ্দিন প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।[৮]

চিত্র-৩: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন সিংহনগরে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়াবহযুদ্ধ হয়ে ছিল এইস্থানটিতে

পরশুরাম ব্রিজে ১ম যুদ্ধ (১৯ জুলাই ১৯৭১)

ফেনী জেলার একটি উপজেলার নাম পরশুরাম। ১৯৭১খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই পরশুরামের বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ির ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্‌ের বাঙালি সৈনিকগণ বিদ্রোহ করে এবং সকল অবাঙালি সৈন্যদের সরিয়ে দেয়। এরপর তারা ফেনীতে সংঘবদ্ধ হয়ে একটি ফাইটিং কোম্পানি গঠন করে। এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনীকে দমন করতে রওয়ানা হয় এবং একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একটি কমান্ডো প্লাটুনকে রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ পরশুরাম-ছাগলাইনয়া উপজেলার শুভপুর ব্রিজ পাহারায় রেখে যায়। এই ছাগলনাইয়া সংকীর্ণ ভু-খণ্ডের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের সহিত যুক্ত করেছে। ফেনীতে সংগঠিত উক্ত ইপিআর কোম্পানি ১৯ জুলাই শুভপুর ব্রিজে আক্রমণ করে এবং ক্যাপ্টেন এনামুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে আনসার, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক ও ছুটিতে থাকা সৈনিকদের নিয়ে একটি যৌথবাহিনী গড়ে তোলা হয়। অনেক দিন পর্যন্ত এই দুই বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি ফেনীকে শত্রুমুক্ত রাখে। কিন্তু ফেনী অঞ্চল পাকবাহিনীর হাতে চলে গেলে জুলাইয়ের শেষ দিকে পরশুরামে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম অত্যন্ত সফলতার সাথে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রবাহিনী দিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করে। পরশুরামে প্রথম যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে মুক্তিসেনারা যথেষ্ট সফলতা অর্জন করে। এতে পাকবাহিনীর প্রায় দেড় শতাধিক সৈন্য নিহত হয়। ১৯৭১খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাইয়ের পরবর্তী সময়ে পশ্চাদপসরণের ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের অল্প কিছু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয় এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গোলাবারুদ প্রতিরক্ষা অবস্থানে ও আশেপাশের পুকুর ডোবায় ফেলে আসতে বাধ্য হয়।[৯]

চিত্র-৪: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই মুক্তিযোদ্ধাগণ এই ব্রিজে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন

আলকদিয়া গণহত্যা (২৭ আগস্ট ১৯৭১)

ছাগলনাইয়া উপজেলায় আলকদিয়া গ্রাম অবস্থিত। ১৯৭১খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ দিকে আনুমানিক ২৭ আগস্টে পাকসেনারা আলকদিয়া গ্রামের তুলাতলী রাস্তার মাথায় তেমুহনীতে, রাস্তার দক্ষিণ দিক ও পশ্চিম দিকে নিরীহ গ্রামবাসীকে লাইনে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন হোসেন মোহাম্মদ মেস্তেরি, সুলতান মোহাম্মদ মেস্তেরি, দেলোয়ার হোসেন, আবুল খায়ের, ফরিদুর রহমান, ওবায়দুল হক, তফাজল হক, আলী আহমদ, আহমদ হোসেন, ভুলু চৌকিদার, ফকির আহম্মদ, ইমাম উদ্দিন, লাতু মিয়া, আমিন শরীফ, মনির আহম্মদ, সিরাজ মিয়া, সুলতান মির হোসেন, বাদশা মিয়া, মুন্সি মিয়া, রাজা মিয়া, নুরুল ইসলাম কালু, মুজিবুল হক, রুহুল আমিন, ছালেহ আহম্মদ, বশির আহম্মেদ, সিদ্দিক আহম্মদ ও সৈয়দ মিয়াসহ আরও নাম না জানা অনেকে ছিলেন। উল্লেখ্য যে পাকবাহিনী সে দিন আলকদিয়া গ্রামে প্রায় শতাধিক নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে বলে জানা যায়।[১০]

চিত্র-৫: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট আলকদিয়ায় গণহত্যার ভয়াবহ স্মৃতি বিজড়িত স্থান

নবাবপুর ও ভোর বাজার যুদ্ধ (২৮ আগস্ট ১৯৭১)

সুবেদার গুল মোহাম্মদের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার বাহিনী সোনাগাজীর বিস্তীর্ণ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও নারী নির্যাতনসহ নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতে থাকে। এমতাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা তা প্রতিহত করার চিন্তা করল। মিরশরাই থানার কমান্ডার সুবেদার রফিক নবাবপুরে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের সাথে আলাপ আলোচনার পর যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ করেন। মহেন্দ্র চৌকিদার বাড়ি ও ফতেহপুর সজল সওদাগর বাড়িতে অবস্থান নিয়ে আক্রমণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ১৯৭১খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৮ তারিখে দুপুর বেলা মেজর গুল মোহাম্মদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী সম্মিলিতভাবে বক্তারমুন্সি ক্যাম্প থেকে নবাবপুর ও ভোর বাজারের দিকে প্রধান সড়ক ধরে এগিয়ে আসছিল। কমান্ডার রফিকের পরামর্শক্রমে গ্রুপ কমান্ডার মো. আবু ইউসুফসহ মুক্তিযোদ্ধারা পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে ডিফেন্স স্থাপন করে।[১১] ইতিমধ্যে পাক হানাদার ও রাজাকারদের সম্মিলিত বাহিনী দুপুর বারোটার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলগত ডিফেন্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কয়েকটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নারী নির্যাতনে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুদের ওপর পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে ত্রিমুখী আক্রমণ চালায়। চার-পাঁচ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রিমুখী আক্রমণে টিকতে না পেরে সন্ধ্যার দিকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে বক্তারমুন্সি বাংলোর দিকে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর ৭/৮ জন নিহত এবং পাকবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী মেজর গুল মোহাম্মদ নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাক ও রাজাকার বাহিনীর ফেলে যাওয়া ১৭টি চাইনিজ রাইফেল, ২৬টি রাইফেল, ৫০০টি বুলেট ও ৫০টি ছাতা উদ্ধার করে। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহ মানু শহিদ হন এবং মুক্তিযোদ্ধা হাবিলদার মফিজুর রহমান, আনোয়ার, আব্দুল কাদের ও ফজলুল হক গুরুতরভাবে আহত হন।[১২]উল্লেখ্য যে উক্ত যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর গুল মোহাম্মদ নিহত হওয়ার পর তার মাথা কেটে মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কমান্ডার আবু ইউসুফ ভারতে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন বোসের নিকট জমা দিলে কমান্ডার মোঃ আবু ইউসুফকে পুরস্কার স্বরূপ ১১০১ টাকা প্রদান করেন এবং বেশ কিছু গোলাবারুদ দিয়ে তাকে পুনরায় বাংলাদেশে প্রেরণ করেন।[১৩]

চিত্র-৬: পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের নবাবপুর ও ভোর বাজারে ১৯৭১ খ্রিস্টব্দের ২৮ আগস্ট এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়

সোনাগাজী থানা ও হাসপাতালে যুদ্ধ (১৫ অক্টোবর ১৯৭১)

সোনাগাজী উপজেলায় সোনাগাজী থানা ও হাসপাতাল অবস্থিত। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পর পরই পাকবাহিনী সোনাগাজী থানাতে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং হাসপাতাল ও থানার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ফলে পাকসেনাদের সোনাগাজী থেকে উচ্ছেদের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা একটি পরিকল্পনা করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর সকাল বেলা একটি মৃত রাজাকারের লাশ নিয়ে পাকবাহিনী ও রাজাকার সদস্যরা হাসপাতাল থেকে বের যাওয়ার সময় ২/৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে। ঐ স্থানের পূর্ব পার্শ্বে প্রায় ৪০০ শত গজ পূর্ব দিকে মুক্তিবাহিনী অবস্থান করছিলো। পাকবাহিনীর ফায়ারের সাথে সাথে গ্রুপ কমান্ডার মোশাররফ হোসেন, গ্রুপ কমান্ডার আব্দুল কাইউম, কমান্ডার এস এম শাহজাহান ও গ্রুপ কমান্ডার সৈয়দ নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ত্রিমুখী আক্রমণ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়।[১৪] এক পর্যায়ে এই যুদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করে। এই যুদ্ধে কয়েকজন পাকসেনা নিহত হয় এবং বাকি পাকসৈন্য ও রাজাকাররা পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস শহীদসহ আরও দুইজন শহিদ হন, কিন্তু তাদের নাম জানা যায়নি ও মুক্তিযোদ্ধা সামছুল হুদাসহ আরো কয়েকজন আহত হন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা সোনাগাজী হাসপাতাল ও থানা দখল করে নেয় এবং ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত নিজেদের দখলে রাখে। উল্লেখ্য যে, উক্ত যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আবুল মালেক, মানিক, হাবিলদার রুহুল আমিন, মনির আহমেদ, মাস্টার কবির আহমেদ মো. খোকন, মাহবুবুল হক ও মো. হেলালসহ প্রায় দেড় শতাধিক অংশ নেন।[১৫]

চিত্র-৭: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর সোনাগাজী থানায় পাকবাহিনীর সাথে ভয়াবহ যুদ্ধের স্মৃতিযুক্ত জায়গা

চিত্র-৮: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর সোনাগাজী হাসপাতালে যুদ্ধের স্মৃতিস্থল

মতিগঞ্জ সিও অফিস অপারেশন ও যুদ্ধ (২৭ অক্টোবর ১৯৭১)

সোনাগাজী উপজেলার একটি ইউনিয়ন হলো মতিগঞ্জ। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হবার পরপরই পাকবাহিনী ফেনী দখল করে স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় মতিগঞ্জ সিও (উন্নয়ন) অফিসে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। ১৯৭১খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর কমান্ডার আব্দুল কাইউম, কমান্ডার এস এম শাহজাহান, কমান্ডার মোশাররফ হোসেন, কমান্ডার গোলাম রসুল ও হাবিলদার মফিজুর রহমানের গ্রুপ সম্মিলিতভাবে মতিগঞ্জ সিও অফিস আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[১৬] পরিকল্পনা মোতাবেক ঐ দিন রাতে উক্ত কমান্ডারগণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ক্যাম্পের খুব কাছাকাছি এসে গেরিলা অবস্থান নেয়। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে রাজাকার ও পাকবাহিনী খোশগল্পে লিপ্ত। ঠিক সেই অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধরা অতর্কিত গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই অতর্কিত আক্রমণে রাজাকার ও পাকসেনারা প্রথমে এদিক সেদিক পালাতে থাকে। পরে কিছুক্ষণের মধ্যে পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনী সংগঠিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এভাবে সারা রাত ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা প্রচণ্ডভাবে ক্যাম্পে গুলিবর্ষণ চালাতে থাকে। এতে পাকসেনা ও রাজাকার বাহিনী বাধ্য হয়ে পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে ১ জন অফিসারসহ ১১ জন পাকসেনা ও ৩ জন রাজাকার নিহত হয় এবং কয়েকজন পাকসেনা ও রাজাকার আহত হয়। অপরপক্ষে মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম ও নুর করিম নামে দুই জন শহিদ হন এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। এই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র, দুইটি মোটর সাইকেল, তিনটি রেডিও ও তিন বাক্স ঔষধ উদ্ধার করে।[১৭]উক্ত যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রশিদ, গোলাম রসুল, হাফিজুর রহমান, মোঃ ইলিয়াস, মোঃ কামাল, মোঃ সাহাবুদ্দিন, এমএড খান ও কবির আহমেদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।[১৮] এটি ফেনী অঞ্চলের সংঘটিত যুদ্ধের অন্যতম সাফল্য।

চিত্র-৯: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর মতিগঞ্জ সিও অফিস অপারেশন ও যুদ্ধের স্থান

চিথলিয়া যুদ্ধ (অক্টোবর মাসের শেষ সময় থেকে ৯ নভেম্বর ১৯৭১)

ফেনী জেলার অন্তর্গত পরশুরাম থানার ৩নং ইউনিয়ন হচ্ছে চিথলিয়া। পরশুরাম রোডের পশ্চিম পাশে চিথলিয়া ইউনিয়নের অবস্থান। ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানির কমান্ডার মেজর মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক চিনুবাগান ও ঘুটমা নামক দুইটি পাকিস্তানি ক্যাম্প ঘেরাও করলে পাকসেনাদের উদ্ধারের লক্ষ্যে পাকবাহিনীর তিনটি ট্রলি ঐ দিন ভোরে ফুলগাজী হতে রওয়ানা হয়। চিথলিয়া রেল স্টেশন পার হওয়ার সাথে সাথে স্টেশনের উত্তর দিক রেল লাইনের পূর্ব দিক ও ডিবি বোর্ডের পশ্চিম দিকের পুকুর হতে মুক্তিবাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে। হাবিলদার এয়ার আহমেদ প্রথম ট্রলি লক্ষ্য করে ২ ইঞ্চি মর্টার ফায়ার করে এবং সেই সাথে এলএম জি ব্রাস্ট ফায়ারের মাধ্যমে তিনটি ট্রলি ধ্বংস করে এবং ১১ জন পাকসেনাকে হত্যা করে। এর প্রেক্ষিতে পাকসেনারা ঐ স্থান থেকে ফায়ার করতে করতে চিথলিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং গুলি বিনিময়ের এক পর্যায়ে হাবিলদার এয়ার আহমেদ শহিদ হন। তিনদিন পর পাকবাহিনীর ৪টি জঙ্গি বিমান আক্রমণ চালায়। এতে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হলেও তাদেরকে প্রতিরক্ষা অবস্থান হতে বিতাড়িত করতে পারেনি। কয়েকদিন মুখোমুখি যুদ্ধ চলার পর মুক্তিযোদ্ধারা প্রায় ৯০ জন পাকসেনাকে ধরে ফেলে।[১৯]

এদিকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর রাতে মুক্তিবাহিনীর একটি দল চিথলিয়ার দক্ষিণে রেললাইনের ওপরে এ্যাম্বুশ বসায়। ৬ নভেম্বর সকাল সাতটায় পাকসেনাদের ট্রলি এ্যাম্বুশের আওতায় এলে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। এতে পাকসেনাদের এক অফিসারসহ চারজন সৈনিক নিহত হয় এবং বেশ কিছু অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হস্তগত হয়। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল কোম্পানি পাকস্তানি সেনাদের আক্রমণ ব্যর্থ করার পর বিলোনিয়া থেকে তাদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করে। সেই অনুযায়ী ৬ নভেম্বর ১০ম ইস্ট বেঙ্গলেরএকটি কোম্পানি চিথলিয়ার উত্তরাঞ্চল দখল করে এবং সলিয়া ও ধনীকুণ্ডার মাঝখানের রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে পরশুরাম ও ফেনীর মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এতে পাকসেনাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং তারা চিথলিয়ার দক্ষিণে পিছু হটতে থাকে। এরপর চিথলিয়ায় পাকসেনারা দু'টি

কোম্পানির শক্তি নিয়ে মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। কিন্তু ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের কোম্পানি অসীম সাহসিকতার সাথে পাকসেনাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেয় এবং মুক্তিবাহিনীর অবস্থানের ওপর পাকবাহিনীর বিমান আক্রমণকালে গোলার আঘাতে একটি বিমান ভূপাতিত হয়। এই যুদ্ধে পাকসেনারা পরাজিত হয়ে পরশুরাম থানা থেকে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে নিজেদের শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।[২০]

চিত্র-১০: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ সময় থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সংঘটিতচিথলিয়া যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান

ছনুয়া গ্রামে গণহত্যা ও নির্যাতন (২ ডিসেম্বর ১৯৭১)

পাকহানাদার বাহিনী ট্রেনযোগে ফেনী থেকে মুহুরীগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় সময় যাতায়াত করত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর কিছু সৈন্য ছনুয়া বাজারে প্রবেশ করেই অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। বাজার থেকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢুকে ছাগল, হাঁস, মুরগি ধরে নিয়ে যায়। গ্রামের একজন নিরীহ গরিব মানুষ আলী আহমদের স্ত্রীকে নির্যাতন করে। এছাড়াও গ্রামের আরো কয়েকজন মহিলাকে ধর্ষণ করে। এরপর শেখ বাহাদুর বাড়ির রুহুল আমিন, সিদ্দিক আহম্মদ, ছেরাজুল হক, মোহাম্মদ দানেশ, শফিকুর রহমান, আবুল হোসেন, রবিউল হক ও হামিদুল্লা হাজীবাড়ির মৌলভী মোহাম্মদ ছেলামত উল্লাহসহ আরো অনেককে বেদম মারধর করে। এমনকি রাজাকার কমান্ডার নুরুল ইসলামের লোকজন ছমেদ আলী ভুঁইয়া বাড়িতেও লুটতরাজ চালায়।[২১]

চিত্র-১১: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর সংঘটিত ছনুয়া গ্রামে গণহত্যার স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি

বিলোনিয়ায় চূড়ান্ত যুদ্ধ ও ফেনী জেলা শত্রুমুক্ত (২ নভেম্বর - ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)

ফেনীর বিলোনিয়ায় সড়ক, নদী ও রেলপথসহ সকল ধরনের যোগাযোগের মাধ্যম বিদ্যমান থাকায় এবং সীমান্তবর্তী হওয়ায় এই স্থানটি পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিলোনিয়া হতে মুক্তিবাহিনীর পশ্চাদপসরণের পরবর্তী তিন মাসের বেশি সময় ধরে পাকবাহিনী সমগ্র বিলোনিয়া তাদের অবস্থান সুসংগঠিত করে। ফলে ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর বিলোনিয়া এলাকায় যুদ্ধের পরিকল্পনা করেন। সেই মোতাবেক ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বাধীন ব্যাটালিয়ানটি চারটি কোম্পানিতে বিভক্ত করে এবং আলফা কোম্পানির নেতৃত্বে লে. ইমাম-উজ-জামান, ব্রাভো কোম্পানির নেতৃত্বে সে. লে. মিজান, চার্লি কোম্পানির নেতৃত্বে লে. দীদার ও ডেল্টা কোম্পানির নেতৃত্বে লে. মোখলেছ ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বিলোনিয়া অপারেশন পরিচালনা করার সার্বিক দায়িত্ব ছিল ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বাধীন ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। এদিকে বিলোনিয়ার পূর্বসীমান্ত ১০ নং সেক্টরের সৈনিকরা এই অপারেশনে অংশ নেয়। ফলে ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি ও ১নং সেক্টরের সৈন্যদেরকে নিয়ে 'বিলোনিয়া টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়। ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম জ্যেষ্ঠ অফিসার এবং বড় ইউনিটের অধিনায়ক হওয়ায় তাঁকে এই ফোর্সের 'টাস্ক ফোর্স কমান্ডার' নিযুক্ত করা হয়।[২২]

এদিকে আগরতলার অদূরে একটি ভারতীয় সেনাশিবিরে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল হিরার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরিকল্পনাটি জানালে তিনি বিলোনিয়ায় আক্রমণের জন্য নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে ক্যাপ্টেন জাফর ইমামকেপরামর্শ দেন। সেই মোতাবেক ক্যাপ্টেন জাফর ইমামমুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করেন।[২৩]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর সূর্যোদয়ের পূর্বেই ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী প্রতিরক্ষা নেয়ার সকল প্রস্তুতিসহকোম্পানিগুলো তাদের পরিখা খনন কাজ সম্পন্ন করে। ঐ দিন সকাল ৭ টার দিকে একটি ট্রলি করে ৫জন জওয়ানসহ পাকসেনার একজন অফিসার দক্ষিণ দিক থেকে সালিয়ার দিকে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো কোম্পানির হাবিলদার এয়ার আহম্মদ তাঁর এলএমজি দিয়ে মাত্র ৭৫ গজ দূর থেকে ট্রলির উপরে প্রচণ্ড বেগে গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। এতে ট্রলির সকল পাকসেনা

নিহত হয় এবং ট্রলিটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ অপারেশনের ফলে পাকসেনাদের পড়ে থাকা ১টি পিস্তল, ১টি রকেট লাঞ্চার, ১টি এলএমজি ও তিনটি রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করার জন্য হাবিলদার এয়ার আহম্মদ পরিখা থেকে ট্রলির দিকে ছুটে যান। ঠিক সেই সময় পাকসেনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষার উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে হাবিলদার শত্রুর গুলিতে শহিদ হন। তবে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো পরে মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করেন।[২৪]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর বিকালে হঠাৎ করে পাকিস্থানি চারটি এফ-৮৬ জেট বিমান বিলোনিয়া এলাকার চারদিকে দু'বার ঘোরে এবং পালাক্রমে দু'টো জেট নিচে নেমে এসে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর তাক করে এবং রকেট নিক্ষেপ শুরু করে দেয়। মুক্তিযোদ্ধারাও তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে ক্ষুদ্রাস্ত্র দিয়ে জেটগুলোর উপর পাল্টা গুলি চালায় এবং সুবেদার মোমিন সাহসিকতার সাথে মেশিনগানটির মাধ্যমে পাকবাহিনীর জেটটির উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু পরক্ষণে পাকবাহিনীর জেট বিমান হতে গোলানিক্ষেপে ভারী মেশিনগানটি ধ্বংস হয় এবং সুবেদার মোমিন ঘটনাস্থলেই শহিদ হন।[২৫]

অন্যদিকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর সূর্যোদয়ের মধ্যে ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের আলফা কোম্পানি শালধর বাজার সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেওয়ার পর পাকসেনারা ঐ দিন সকালে উক্ত এলাকার উপর দু'বার প্রতি আক্রমণ চালায় কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা তা সফলতার সাথে প্রতিরোধ করে। এদিকে ভারতীয় কমান্ডারগণ ও মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ যৌথভাবে সমগ্র এলাকা মুক্ত করার জন্য বিলোনিয়া-পরশুরাম এলাকায় সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[২৬] ১০ নভেম্বর মধ্যরাতে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী কর্তৃক সমন্বিত আক্রমণ শুরু করার পূর্বে সমগ্র এলাকায় ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনের ডিভিশনাল আর্টিলারি দ্বারা আধঘণ্টা যাবৎ গোলাবর্ষণ করা হয় এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে মিত্রবাহিনীর ৩ ডোগরা রেজিমেন্ট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে শত্রুর উপর আক্রমণ চালায়। উল্লেখ্য যে, তুমুল যুদ্ধের পর পাকবাহিনীর ২ জন অফিসার ও ৭০ জন সৈনিক আত্মসমর্পণ করে। ভারী হাতিয়ার, হাজার হাজার ক্ষুদ্রাস্ত্র, গোলাবারুদ, রকেট লাঞ্চার ও মর্টারের গোলা উদ্ধার করা হয়।[২৭]এদিকে মুক্ত হওয়া পরশুরাম থানায় মুক্তিবাহিনী বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।[২৮]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর ফেনীর উত্তর পর্যন্ত সমগ্র এলাকাটি দখল করার জন্য সীমান্তের উভয় দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যরা অনুপ্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিকল্পনা মোতাবেক ২১ কিংবা ২২ নভেম্বর রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য ট্যাংকের সাহায্যপুষ্ট হয়ে সীমান্তের উভয়দিক থেকে বন্দুয়া-দৌলতপুর-পাঠাননগর রেখা বরাবর প্রবেশ করে এবং বিলোনিয়া পকেটের দক্ষিণপ্রান্ত অবরুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু পাকবাহিনী বিষয়টি জানতে পেরে আটকানোর পূর্বেই তারা তাড়াতাড়ি করে বিলোনিয়ায় তাদের সকল অবস্থান পরিত্যাগ করে ফেনীতে পশ্চাদপসরণ করে।[২৯]

এদিকে ৩১ জাট রেজিমেন্টবন্দুয়া-দৌলতপুর,১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগন্ধব্যপুর-পাঠাননগর, ৩২ মাহার দক্ষিণ সতের এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিরক্ষা সীমানার

সবচেয়ে পূর্বপ্রান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে ছিল । মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী বিলোনিয়ার প্রতিরক্ষা লাইন থেকে পাকসেনাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং ফেনী-ছাগলনাইয়া রোডে চলাচলরত পাকসেনাদের গাড়ির উপর ফায়ার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর নিয়মিত যুদ্ধ ঘোষিত হলে কিলো ফোর্স ও মুক্তিবাহিনী ফেনীর উপর চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর ফেনীর সিও অফিস ও ফেনী থানাসহ পাকসেনা এবং রাজাকারদের সকল ক্যাম্প দখল করে নেয় এবং ৬ ডিসেম্বর ফেনী পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করেন।[৩০] উপায়ন্তর না দেখে ঐ দিন পাকসেনারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেলে শুভপুর সেতু হয়ে চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায়। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা এই সফল যুদ্ধের মাধ্যমে পাকবাহিনীর হাত থেকে ফেনী জেলাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ফেনী পুরোপুরি শত্রু মুক্ত ও স্বাধীন হয়।[৩১]

চিত্র-১২: ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেনীর বিলোনিয়া অঞ্চলে পাকবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়

পরিশেষে বলা যায় যে, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফেনী জেলার মুক্তিকামী জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নেতৃত্বে অত্র জেলার মুক্তিকামী জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাগণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর নেতৃত্বে এ অঞ্চলে মুক্তিবাহিনী, গেরিলা বাহিনী, মুজিব বাহিনী, যৌথ বাহিনী ও মিত্র বহিনীসহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীবাহিনী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সহযোগিতা করেছিল। এ জেলায় মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগী বাহিনীর প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক যুদ্ধ, অপারেশন,গণহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল যা পূর্বেই বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ফেনীর জেলার গুরুত্বপূর্ণ দশটি সন্মুখযুদ্ধ ও গণহত্যার ঘটনাবলিপ্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত, মাঠ জরিপ, সাক্ষাৎকার, গণকবর ও যুদ্ধস্থল পরিদর্শন

ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্লেষণপূর্বক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসব যুদ্ধ ও অপারেশনের মাধ্যমেই মুক্তিকামী জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাগণ স্বাধীনতা বিরোধী পাকবাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ফেনী জেলাকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত ও স্বাধীন করতে সক্ষম হয়। আমি আশা করি এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে ফেনী জেলার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ও নির্ভুল ইতিহাস জানাতে সহায়তা করবে এবং বিকৃত ইতিহাস জানা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা পাবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. জমির আহমেদ, *ফেনীর ইতিহাস*, চট্টগ্রাম, সমতট প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ. ০৮

২. মো. আখতারুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধঃ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০০৯, পৃ. ৪৪

৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, পৃ. ৩-৪

৪. খালেদ মোশাররফ, *মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টর ও কে ফোর্স*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৭৪

৫. *প্রাগুক্ত*

৬. সাক্ষাৎকারঃ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. আবু ইউসুফ, পিতা- মৃত বজলুর রহমান, গ্রাম-নবাবপুর, ইউনিয়ন- নবাবপুর, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২১.১২.২০১৬

৭. সাক্ষাৎকারঃ মুক্তিযোদ্ধা সালেহ আহমেদ (সালু), পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ, গ্রাম- দক্ষিণ দৌলতপুর, ইউনিয়ন- ফুলগাজী, উপজেলা- ফুলগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২২.১২.২০১৬

৮. সাক্ষাৎকারঃ মুক্তিযোদ্ধা মো. রফিকুল ইসলাম, পিতা- মৃত জমির আহমদ, গ্রাম- সিংহনগর, ইউনিয়ন- ১০নং গোপালি, উপজেলা- ছাগলনাইয়া, জেলা- ফেনী, তারিখ-২২.১২.২০১৬

৯. সাক্ষাৎকারঃ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. আবু ইউসুফ, পিতা- মৃত বজলুর রহমান, গ্রাম-নবাবপুর, ইউনিয়ন- নবাবপুর, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২১.১২.২০১৬; শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

১০. সাক্ষাৎকারঃ মুক্তিযোদ্ধা সালেহ আহমেদ (সালু), পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ, গ্রাম- দক্ষিণ দৌলতপুর, ইউনিয়ন- ফুলগাজী, উপজেলা- ফুলগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২৪.১২.২০১৬; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

১১. সাক্ষাৎকারঃ কমান্ডার এস এম শাহজাহান, পিতা- মৃত সৈয়দুর রহমান, গ্রাম-ভাদাদিয়া, ইউনিযন-৪ নং মতিগঞ্জ, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২১.১২.২০১৬

১২. সাক্ষাৎকারঃ মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা খন্দকার, পিতা- মৃত নুরুল হক খন্দকার, গ্রাম- চর সোনাপুর, ইউনিয়ন- ৮নং আমিরাবাদ, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২২.১২.২০১৬

১৩. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে ফেনী*, ঢাকা, বিজয় প্রকাশ, ২০০৮, পৃ. ১৪২-১৪৩

১৪. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. আবু ইউসুফ, পিতা- মৃত বজলুর রহমান, গ্রাম-নবাবপুর, ইউনিয়ন- নবাবপুর, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২২.১২.২০১৬

১৫. সাক্ষাৎকার: কমান্ডার এস এম শাহজাহান, পিতা- মৃত সৈয়দুর রহমান, গ্রাম-ভাদাদিয়া, ইউনিযন-৪ নং মতিগঞ্জ, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২২.১২.২০১৬

১৬. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা কবির আহমদ, পিতা- মৃত নুর আহমদ, গ্রাম- নাজিরপুর, ইউনিয়ন- ভোরবাজার, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২৩.১২.২০১৬

১৭. সাক্ষাৎকার: কমান্ডার এস এম শাহজাহান, পিতা- মৃত সৈয়দুর রহমান, গ্রাম-ভাদাদিয়া, ইউনিযন-৪ নং মতিগঞ্জ, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২৩.১২.২০১৬

১৮. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ২য় খন্ড, ঢাকা, এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০৮, পৃ. ৮৫৮

১৯. সাক্ষাৎকার: কমান্ডার সৈয়দ নাসির উদ্দিন, পিতা- মৃত আনোয়ার আহম্মদ, গ্রাম- বাঘরিয়া, ইউনিয়ন- সোনাগাজী পৌরসভা, উপজেলা- সোনাগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ- ২৩.১২.২০১৬

২০. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪

২১. সাক্ষাৎকার: মুক্তিযোদ্ধা সালেহ আহমেদ (সালু), পিতা- মৃত আব্দুল আজিজ, গ্রাম- দক্ষিণ দৌলতপুর, ইউনিয়ন- ফুলগাজী, উপজেলা- ফুলগাজী, জেলা- ফেনী, তারিখ-২৪.১২.২০১৬; বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮১৯-২০

২২. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭

২৩. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৮২১

২৪. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

২৫. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, এরিয়া সদর দপ্তর কুমিল্লা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১২-৮১৩

২৬. গোলাম মুস্তাফা (সম্পা.), *ফেনী বিলোনিয়া রণাঙ্গনের এক প্রান্তর*, ঢাকা, সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ, ২০১২, পৃ. ৮২

২৭. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১

২৮. গোলাম মুস্তাফা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

২৯. শফিকুর রহমান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫

৩০. গোলাম মুস্তাফা (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮; আবু মোহাম্মদ দোলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৯৪